মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ

সাহিত্য পত্রিকা

Journal.bangla.du.ac.bd
Print ISSN: 0558-1583
Online ISSN: 3006-886X
বর্ষ: ৬০ সংখ্যা: ১-২
ফাল্গুন ১৪৩১॥ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
প্রকাশকাল: আগস্ট ২০২৫
Issue DOI: 10.62328/sp.v60i1-2

DOI: 10.62328/sp.v60i1-2.7
প্রবন্ধ জমাদান: ১৮ এপ্রিল ২০২৫
প্রবন্ধ গৃহীত: ১৫ মে ২০২৫
পৃষ্ঠা: ১০৭-১২৮

আবদুল হাকিমের বুদ্ধিজীবী সত্তা: কবির তৎপরতার নিরিখে

মো. নাজমুল হোসেন
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: najmul@du.ac.bd

সারসংক্ষেপ

বর্তমান আলোচনায় মধ্যযুগের কবি আবদুল হাকিমের (আনু. ১৬০০-১৬৭০) *ইউসুফ-জলিখা* (১৬৩৭), *লালমোতি সয়ফুলমুলক* (১৬৪৭), *দুররে মজলিশ*, *নূরনামা* এবং *হানিফার লড়াই* প্রভৃতি কাব্যের আলোকে তাঁকে বুদ্ধিজীবী হিসেবে পাঠের আওতায় আনা হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বাঙালি মুসলমান জনসমাজের রস-রুচি, ঐতিহ্য নির্মাণ এবং জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে হাকিমের সযত্ন প্রয়াস লক্ষ করা যায়। এ ছাড়া মধ্যযুগের বৈরী পরিবেশে তিনি ধর্মীয় শাস্ত্রকথা অনুবাদের ক্ষেত্রে বাংলা তথা হিন্দুয়ানি ভাষার পক্ষে জোরালো অবস্থান নিয়েছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে ভাষিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে হাকিমের দ্রোহের শক্তির উৎস এবং আধিপত্যশীল ক্ষমতা-কাঠামোর বিপরীতে তাঁর প্রস্তাবিত বিকল্প ক্ষমতা-কাঠামোর স্বরূপ অনুসন্ধান করা হয়েছে।

মূলশব্দ

মধ্যযুগের কাব্য, বাঙালি মুসলমান, বাংলা ভাষা, হিন্দুয়ানি ভাষা, কাব্যানুবাদ, ভাষিক আধিপত্য, বুদ্ধিজীবী, ক্ষমতা-কাঠামো, পিরবাদ।

মধ্যযুগের বাঙালি মুসলমান কবিদের মধ্যে বাংলাদেশে আলোচনার কেন্দ্রে দীর্ঘদিন ধরে অবস্থান করছেন আবদুল হাকিম (আনু. ১৬০০-১৬৭০)। নোয়াখালির কবি আবদুল হাকিম সতেরো শতকের চতুর্থ দশক থেকে সপ্তম দশক কালপর্বে রচনা করেছেন *ইউসুফ-জলিখা* (১৬৩৭), *লালমোতি সয়ফুলমুলক* (১৬৪৭), *দুররে মজলিশ, নূরনামা* এবং *হানিফার লড়াই* প্রভৃতি কাব্য। কাব্যের নাম থেকে বোঝা যায়, বাংলায় মুসলমান সমাজের প্রতিষ্ঠা-পরবর্তী জনসমাজের চিত্ত-বিনোদন, ঐতিহ্য নির্মাণ এবং যাপিত জীবনের বিশ্বাস-সংস্কার সংশ্লিষ্ট নানা বয়ানের প্রকাশ কবি তাঁর দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছেন, যা তাঁকে 'জনবুদ্ধিজীবী'র অভিধা প্রদান করে। কোনো রাজসভার কবি না হওয়ায় জনসমাজের জীবনযাপন-পদ্ধতির সঙ্গে তাঁর গভীর যোগ ছিল, এজন্য সেই জনসমাজকে তিনি যেমন প্রভাবিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন, তেমনি বাইরে থেকে আরোপিত কর্তৃত্ববাদী ডিসকোর্সের মোকাবিলা করার জন্য তিনি বেপরোয়া প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতেও কুণ্ঠিত হননি।

বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী বয়ানে আবদুল হাকিমকে সুবিধামতো ব্যবহার করার নজির বিদ্যমান। এক্ষেত্রে হাকিমের বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগের দিকেই সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকতে দেখা যায়। কিন্তু হাকিমের অবিনাশী উচ্চারণ কি শুধুই বাঙালি হিসেবে তাঁর আত্মপরিচয় প্রদানের ঘোষণা, না কি তা কোনো খণ্ডিত পাঠের বিভ্রম? তিনি কি ধর্মীয় ভাবাদর্শের প্রচার করেননি? না কি বাঙালি হয়েও তিনি চিন্তাচর্চায় ধর্মকে আত্মস্থ করে বিকল্প কোনো কাঠামো প্রস্তাব করেছেন? এই প্রশ্নগুলোকে সামনে রেখে বর্তমান প্রবন্ধের প্রথমাংশে আবদুল হাকিম সম্পর্কে প্রচলিত পাঠ-পর্যালোচনার প্রয়াস থাকবে। দ্বিতীয় অংশে, এসব প্রচলিত পাঠের বাইরে আন্তোনিও গ্রামসি, এডওয়ার্ড সাঈদ এবং গৌতম ভদ্রের বুদ্ধিজীবী বিষয়ক তাত্ত্বিক আলোচনার ভিত্তিতে বুদ্ধিজীবী হিসেবে হাকিমকে নতুন করে পাঠের আওতায় আনা হবে। প্রবন্ধের তৃতীয় অংশে আবদুল হাকিমের বুদ্ধিজীবী সত্তা উন্মেষের কার্য-কারণ অনুসন্ধান এবং চতুর্থ অংশে তৎপরতার নিরিখে তাঁর বুদ্ধিজীবিতার স্বরূপ বিশ্লেষণের প্রয়াস থাকবে।

১

আবদুল হাকিমকে মূলত জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবাদপ্রতিম ঐতিহ্য হিসেবে পাঠ করা হয়। এই বয়ানে দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা ভাষা বিষয়ক দ্বন্দ্ব, যা ১৯৪৭ পরবর্তীকালে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে উত্তুঙ্গ পর্যায়ে উঠেছিল, সেই দ্বন্দ্বের ঐতিহ্যবাহী পক্ষ হিসেবে হাকিমকে যুক্ত করা হয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদের তাত্ত্বিকগণ এ সময়ে আবদুল হাকিমের সেই বিখ্যাত উচ্চারণ 'যে সব বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী। সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি॥ /দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না য়ুয়াএ।/ নিজদেশ ত্যাগি কেন বিদেশে না যায়॥"—এর সঙ্গে সুর মিলিয়ে বাংলাভাষা-বিমুখ একটি বিশেষ গোষ্ঠীকে গালমন্দ করে আসছে। অর্থাৎ বাঙালির মাতৃভাষার মর্যাদার স্মারক হিসেবে হাকিমের 'বঙ্গবাণী' বাংলা ভাষার অধিকার আদায়ের আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে হাকিমকে উপস্থাপন করা হয় বাংলাভাষার পক্ষের উকিল হিসেবে। এঁদের মধ্যে মুহম্মদ এনামুল হক পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে, যারা বাংলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞা-অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করত তাদের উপলক্ষ্য করে, মধ্যযুগের বাংলা বিরোধীদের সম্পর্কে বলেন—

> ইঁহারা পুরুষ পরম্পরাগতভাবে এ দেশে বাস করিলেও এ দেশীয় ভাষার প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেন বলিয়া, আমাদের কবি আবদুল হাকিম তাঁহার *নূরনামা* নামক গ্রন্থের ভূমিকায় ইঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া যে কড়া ভাষায় শ্লেষ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শুধু পূর্ব্ববঙ্গীয় মুসলমানের বঙ্গভাষা-প্রীতি ঘোষণা করিতেছে না, বরং এখনও যাহারা বাঙ্গালী মুসলমানদের ঘাড়ে উর্দ্দুর মাম্‌দো ভূত চাপাইতে চাহেন, তাঁহাদের অদ্ভুত মানসিকতাকেও ইহা বিজ্ঞ-জনোচিত বিদ্রুপ করিতেছে। (২০১৯: ১২৫)

আবার হুমায়ুন আজাদ, বাংলাভাষার বিরোধীদের শত্রু হিসেবে গণ্য করে আবদুল হাকিমকে বাংলা ভাষার পরম মিত্র হিসেবে অভিহিত করতে চান। তিনি বলেন—

> মধ্যযুগেই বাঙালি মুসলমান ভাষাপ্রশ্নে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গিয়েছিল: একগোত্রে ছিল গুটিকয় সুবিধাবাদী সুবিধাভোগী, যাদের স্বপ্নে ইরান-তুরান, আরবি-ফারসি; অন্য গোত্রে ছিল বিশাল বাঙালি মুসলমান শ্রেণী, বাঙলাদেশ ও বাঙলাই ছিল যাদের বাস্তব ও স্বপ্ন। সতেরো শতকে এক শ্রেণীর বাঙালি বাঙলার সাথে শত্রুতা করে যাচ্ছিলো সম্ভবত প্রচণ্ডভাবেই, যার প্রতিক্রিয়ায় কবি আবদুল হাকিমের বুক থেকে উৎসারিত হয়েছিলো ছন্দোবদ্ধ অবিনশ্বর ক্রোধ। (১৯৯৮: ১৮)

এ ছাড়া মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন বলেন, 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আবদুল হাকিমের যে একটা স্বাভাবিক টান ছিল তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়' (২০০৪: ১৪৫)। আবার, আজহার ইসলাম বলেন, 'যে কারণে তিনি [আবদুল হাকিম] আমাদের কাছে বড়ো, সেটি হচ্ছে তাঁর অসাধারণ মাতৃভাষা তথা বাংলা ভাষাপ্রীতি' (১৯৫৮: ২৬২)। এমনকি আবদুল হাকিমের কাব্য নিয়ে যিনি পিএইচডি গবেষণা করেছেন, সেই রাজিয়া সুলতানাও 'কবির ভাষানুরাগে'র কারণেই তাঁকে নিয়ে বিস্তৃত গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন বলে জানিয়েছেন (১৯৮: প্রসঙ্গকথা)।

অর্থাৎ এঁরা সকলেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের ঐতিহ্য হিসেবে আবদুল হাকিমকে ব্যবহার করেছেন। এক্ষেত্রে সবাই এককেন্দ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে হাকিমকে পাঠের আওতায় এনেছেন এবং তাও আবার *নূরনামা* কাব্যের অংশবিশেষের ওপর ভিত্তি করে, খণ্ডিত পাঠের মাধ্যমে। এঁদের আলোচনায় মাতৃভাষার প্রতি হাকিমের যে প্রীতি, টান, মিত্রতা ও অনুরাগের কথা বলা হচ্ছে, তা কতটা ভাষানুরাগ আর কতটা রাজনৈতিক অবস্থান সে বিষয়টি স্পষ্ট নয়; কারণ তিনি আরবি লিপিতে বাংলা ভাষায়ও একটি কাব্য রচনা করেছেন। আবার *নূরনামা*র বাইরেও কবি বাংলা ভাষায় একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন, যেখানে কবির স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গির উৎসারণ ঘটেছে।

সম্প্রতি বাঙালি জাতীয়তাবাদী বয়ানের বাইরে থিবো দুবের এবং আয়েশা ইরানি প্রমুখ পশ্চিমা গবেষক মধ্যযুগের মুসলমান কবিদের কাব্য রচনার বিশেষ উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। থিবো দুবের মুসলিম বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি স্থান হিসেবে আরাকান রাজ্যকেই স্বীকৃতি দিতে চান। শুধু তাই নয়, সেখানে আবার বাংলা সাহিত্যের দুটো কেন্দ্রের সম্ভাবনার কথা বলেন তিনি, চট্টগ্রাম ও ম্রোক-উ (দুবের ২০১৪: ৬১)। আয়েশা ইরানিও একই কথা বলেন এবং তাঁরা উভয়েই আবার ঐ দুই কেন্দ্রের সাহিত্যের মধ্যে কিছু পার্থক্য চিহ্নিত করেন। আরাকান রাজসভার কবিদের প্রসঙ্গে থিবো বলেন—

> রাজধানীর কবিরা সভাকবি ছিলেন এবং তাঁদের রচনায় সভাসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য উপস্থিত; যেমন—রাজা, রাজ্য ও পৃষ্ঠপোষকের দীর্ঘ প্রশংসা এবং কবি ও সভাসদদের পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধের প্রশংসা করা। এই শহরের সাহিত্যেও লেখকদের উপরে সুফিবাদের প্রভাব বিদ্যমান, কিন্তু চট্টগ্রামের দেশী ফকিরিধারার বিপরীতে তাঁরা বিশিষ্ট সুফি সম্প্রদায়, যেমন—চিশতিয়া ও কাদিরিয়া তরিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত।
>
> সভাকবি হিসেবে তাঁরা আধ্যাত্মিক ভাবান্বিত রূপক প্রেমকাহিনী লিখেছেন। চট্টগ্রাম লেখকদের মতো তাঁদের উদ্দেশ্য ইসলাম ধর্মের প্রচার ছিল না। তবে অনুবাদকর্মের মাধ্যমে রাজধানীবাসী সমৃদ্ধ বাঙালি মুসলিমদের সংস্কৃতি ও আদব সংস্কার করা তাঁদের পরিকল্পনা ছিল। (২০১৪: ৬১)

অর্থাৎ রাজসভা-সংশ্লিষ্ট কবিগণ আধ্যত্মিক ভাবান্বিত প্রেমকাহিনি রচনা করেছেন, যেখানে আধ্যাত্মিকতা অপেক্ষা মানবীয় প্রেমানুভূতিই প্রধান হয়ে উঠেছে। তবে রাজসভার বাইরে যারা ছিলেন, তাঁদের প্রসঙ্গে আয়েশা ইরানি বলেন—

> The vast majority of these early-modern east Bengali Muslim authors ... wrote independently. They were usually affiliated with local sufi orders and were interested in transmitting Islamic teachings to the local peoples, unlettered in Persian and Arabic. As a result, they were keenly involved in the translation of Perso-Arabic works on Islamic and sufi doctrine and ethics into Bangla. (2021: 14)

অর্থাৎ, রাজসভার বাইরে থেকে যাঁরা সাহিত্য রচনা করেছেন, তাঁদের লক্ষ্য ছিল ইসলাম প্রচার এবং তাঁরা কোনো বিশিষ্ট সুফি ঘরানার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে হাকিমের *নূরনামা* গ্রন্থ পাঠ করে থিবো দুবের বলেন—

> Hakim's advocacy in favour of the use of the regional language and his reading of the persian Nurnama both point to a context of conversion in the rural areas of eastern Bengal and to the need to create a space for the making of a Bengali Islam beyond cultural and linguistic hegemonic discourses. (2022: 41)

থিবোর বক্তব্য অনুযায়ী, আবদুল হাকিমের *নূরনামা* কাব্যে যে সৃষ্টিতত্ত্বের উল্লেখ করা হয়েছে, তা এ অঞ্চলে প্রচলিত বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ায় অন্য ধর্মের মানুষ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে আর এভাবেই বাঙালি মুসলমান সমাজ তৈরি হয়েছে। অতএব *নূরনামা* যে এই উদ্দেশ্যপ্রসূত রচনা, তাতে খুব বেশি সন্দেহ থাকে না। কিন্তু হাকিমের আরেকটি বৃহৎ রচনা *দুররে মজলিশ* এবং *ইউসুফ-জলিখা* ও *লালমোতি সয়ফুলমুলক* প্রভৃতি রোমান্স কাব্য সম্পর্কে সহজেই থিবো বা ইরানির বক্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হওয়া সম্ভব নয়। কেননা *দুররে মজলিশ* কাব্যে তিনি জীবনযাপনের জন্য যেসব নীতি প্রচার করেন, তা অন্য ধর্মের মানুষের জন্য নয়। হাকিমের পাঠকশ্রেণি সেখানে মুসলমান সমাজভুক্ত। আবার হাকিম রাজদরবারের কবি না হয়েও রোমান্স কাব্য অনুবাদ এবং রচনা করেছেন। তাঁর ঐসব রোমান্সধর্মী প্রণয়োপাখ্যানও আধ্যাত্মিকতা বা মানবীয়তার চেয়ে লৌকিক আচরণীয় ধর্মের শিক্ষা ও নীতিচর্চার দিকেই মুসলমান পাঠককে আহ্বান জানায়।

ফলে হাকিম একাধারে বাংলা ভাষাপ্রেমিক এবং অন্য ধর্মের মানুষকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করার কর্মী হিসেবে পাঠের আওতায় এসেছেন। কিন্তু এসব পাঠের বাইরেও আবদুল হাকিম

ইসলাম ধর্মের শাস্ত্রীয় ও ভাষিক আধিপত্যের বাইরে একটি বিকল্প ক্ষমতা-কাঠামোর প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট। এদিক থেকে তাঁকে বুদ্ধিজীবী হিসেবে পাঠ করার সুযোগ রয়েছে, এ লক্ষ্যে বিভিন্ন তাত্ত্বিকের আলোচনা থেকে বুদ্ধিজীবীর চারিত্র্য-লক্ষণ চিহ্নিত করা যেতে পারে।

২

মানুষ বুদ্ধিমান প্রাণী, কিন্তু বুদ্ধিমান মানেই বুদ্ধিজীবী নয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন তাত্ত্বিক বুদ্ধিজীবীর বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। এঁদের মধ্যে বিনয় ঘোষ বুদ্ধিজীবীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন—

> প্রত্যেক সমাজে নানা গোষ্ঠীভুক্ত এমন কিছু লোক থাকেন, যাঁদের কাজ হলো সেই সমাজের জীবনদর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি রচনা করা এবং ব্যাখ্যা করা। যাঁরা সমাজের এই জীবনদর্শন ব্যাখ্যা করেন তাঁরাই বিদ্বৎসমাজের অন্তর্ভুক্ত হবার যোগ্য। তাঁরাই প্রকৃত বিদ্বৎজন। (১৯৪৮: ৭-৮)

আবার ইতালীয় তাত্ত্বিক আন্তোনিও গ্রামসি *কারাগারের নোটবই*য়ে (১৯২৯) বুদ্ধিজীবীর চারিত্র্য-লক্ষণ চিহ্নিত করেছেন। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন, সাংস্কৃতিক আধিপত্য সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় একটি সমাজের ধর্ম, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, কিংবদন্তির মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র তার ভাবাদর্শকে প্রবাহিত করে। এই ভাবাদর্শ প্রচারের কাজে নিয়োজিত থাকেন বুদ্ধিজীবীরা। তবে বুদ্ধিজীবীদের আবার দুটো বর্গ, 'ঐতিহ্যগত বুদ্ধিজীবী', যাঁরা প্রজন্মান্তর ধরে একই কাজে নিয়োজিত থাকেন, যেমন শিক্ষক, পুরোহিত প্রভৃতি। অন্য দিকে আছে 'জৈব বুদ্ধিজীবী', সমাজে অসঙ্গতি দেখা দিলে এবং বিক্ষোভ ঘনীভূত হলে, তাঁরা জনসমাজের প্রতিনিধি হয়ে ওঠেন; কোনো মতাদর্শকে চ্যালেঞ্জ করে বিকল্প মতাদর্শের প্রস্তাব করেন। ওই বিক্ষোভের কারণ তাঁরা ব্যাখা করেন এবং প্রাপ্ত তথ্যকে প্রয়োগের মানদণ্ডে যাচাই করে, তা জনসাধারণের চেতনার অংশ হিসেবে প্রস্তুত করেন। একজন বুদ্ধিজীবী তাঁর সমাজের মধ্যে থেকেই নতুন ভাবাদর্শ প্রস্তাব করেন বলে, সমাজে সে ভাবাদর্শ ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়।

এডওয়ার্ড সাঈদ বলেন, 'আমরা সবাই জাতীয় গণ্ডির মধ্যে বসবাস করি, আমরা জাতীয় ভাষা ব্যবহার করি এবং জাতীয় সম্প্রদায়ের ভেতরে বসবাসকারী একজন বুদ্ধিজীবীকে একটা বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়' (২০২২: ৭৪)। তাহলে দেখা যাচ্ছে, কেবল ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিশেষ বাস্তবতার মধ্যেই বুদ্ধিজীবীর প্রকাশ ঘটে এবং জনসমাজের মধ্যে থেকেই তিনি লড়াইয়ে যুক্ত থাকেন। এক্ষেত্রে অধস্তন শ্রেণির সংস্কৃতি সম্পর্কে আধিপত্যবাদী শ্রেণির তৈরি করা ভুল ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবী প্রতিবাদে সোচ্চার হন, আধিপত্যের সমালোচনা করেন এবং বিকল্প ব্যাখ্যা হাজির করেন। অর্থাৎ বুদ্ধিজীবী গোলকধাঁধার ভেতর থেকে মানুষকে বের করে আনার কাজ করেন এবং জনসমাজের জন্য তিনি বিশেষ মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শন গড়ে তোলেন, প্রচার করেন এবং নিজেও তা ধারণ করেন।

এ ছাড়া সাঈদ মনে করেন, বুদ্ধিজীবীকে ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে দূরে থাকতে হয়, তা না হলে তাঁর চিন্তার স্বাধীনতা বিপন্ন হতে পারে। সামন্ত যুগের দরবারাশ্রিত বুদ্ধিজীবীর সাথে জনগণের যোগ ছিল না, কিন্তু যাঁরা দরবারাশ্রিত নন, তাঁরা জনসমাজের মধ্যে থেকেই কাজ করতে পারেন। এই ধরনের বুদ্ধিজীবীদের প্রসঙ্গে সাঈদ মনে করেন—

> ইহজাতিক পৃথিবী, আমাদের পৃথিবী, যে পৃথিবী মানুষের প্রচেষ্টায় ঐতিহাসিক এবং সামাজিকভাবে গড়ে উঠেছে, এখানে বুদ্ধিজীবীদের শুধু নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে হবে। ... প্রকৃতপক্ষে আমি আরো বলতে চাই, বুদ্ধিজীবীদেরকে জীবনব্যাপী দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়তে হয়। ঐ সমস্ত পবিত্র দর্শন বা পুস্তকের রক্ষাকর্তাদের সাথে, যাদের শক্তিশালী ক্ষমতা, কোনো মতানৈক্যতা এবং সুস্পষ্টভাবে কোনো বিভিন্নতা সহ্য করতে পারে না। মতামত এবং প্রকাশভঙ্গির অদম্য স্বাধীনতাই বুদ্ধিজীবীদের প্রধান রক্ষাকবচ। এই রক্ষাব্যূহ পরিত্যাগ করলে অথবা এর ভিত্তির উপর কোনো বিকৃতি সহ্য করার পরিণামে বুদ্ধিজীবীর পরিচয় কলঙ্কিত হয়। (সাঈদ ২০২২: ৬৮)

শাস্ত্রের অভিভাবকেরা সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা ও জ্ঞান অন্বেষণের স্পৃহাকে অবদমিত করে রাখেন, তাই বুদ্ধিজীবী তাঁদের বিরোধী অবস্থানে থাকবেন। অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের স্বাধীনতার বিস্তৃতি ঘটানো এবং জ্ঞান অর্জন-স্পৃহাকে উৎসাহিত করা।

তবে গৌতম ভদ্র এ বিষয়ে সাঈদের মতো ভাবেন না যে, কেবল সেক্যুলার বা নিরপেক্ষ ইহবাদী ব্যক্তিই 'বুদ্ধিজীবী' হবেন, অথবা বৌদ্ধিক চর্চা কেবল সেক্যুলার জ্ঞানজগতেই পাওয়া সম্ভব। এর বিপরীতে তিনি মনে করেন, আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলা আর মুক্তচিন্তার বিস্তারের প্রয়াস, যে কোনো 'ধর্মকে কেন্দ্র করে হতে পারে, হতে পারে সেক্যুলারিজমের মাধ্যমে। বিশেষ কোনো সম্প্রদায়কে ঘিরেও তার সূচনা সম্ভব' (২০২১: ৫৯)। অর্থাৎ সেক্যুলারবোধ থেকে শুধু নয়, ধর্মীয় বোধ থেকেও বুদ্ধিজীবী তৈরি হতে পারেন। যেহেতু 'ইসলামী ভাবাদর্শে "ইলম"-এর চর্চা তুঙ্গে, হকিকত জানার জন্য বাহাত্তরটা ফিরকা' তর্কে মগ্ন (গৌতম ২০২১: ৭১)। অর্থাৎ ইসলাম ধর্মে একাধিক ভাবাদর্শের তর্ক-বিতর্ক বিদ্যমান এবং তর্ক বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চারই পরিণাম; অতএব মুসলমান সমাজেও বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। আবার ইসলাম যখন সম্প্রসারিত হয়েছে, তখন অধিকৃত এলাকায় বিদ্যমান চিন্তা ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাকে জ্ঞানতাত্ত্বিক মোকাবিলায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে। আর এ কারণেই—

> আরবের ইসলামই একমাত্র ইসলাম নয়। ইরানের ইসলাম আছে, মধ্য এশিয়ায় আছে, দক্ষিণপূর্ব এশিয়াও আছে। আঠারোশো শতকের ভারত ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতি চর্চার সেরা ভূখণ্ড। নিঃসন্দেহে টেক্সট-এর প্রাধান্য ইসলামে অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি। এই সভ্যতার গড়নে অসংখ্য তফসির তৈরি হয়েছে, এক একটা তফসিরের ব্যাখ্যা বা ঝোঁক এক-এক রকমের। (গৌতম ২০২১: ৬৯)

বাংলাদেশেও আরব-ইরান-উত্তরভারত হয়ে আগত ইসলাম ধর্ম, বিদ্যমান জ্ঞানকাণ্ডের সঙ্গে গ্রহণ-বর্জনের সম্পর্ক তৈরি করেই এগিয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় মধ্যযুগে বাংলার ধর্ম-সাধনা এবং শাস্ত্রানুবাদে ইসলাম ধর্ম শুধু কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং এর দার্শনিক বিকাশও ঘটেছে। আবদুল হাকিমও ইসলাম ধর্মকে আত্মস্থ করে জ্ঞানের প্রসার সার্বজনীন করার মধ্য দিয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গির ভিত্তিতে বিকল্প ক্ষমতা-কাঠামো নির্মাণে প্রয়াসী হয়েছেন।

৩

এ পর্যায়ে আমরা দেখার চেষ্টা করব আবদুল হাকিম কোন পরিস্থিতিতে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় নিজেকে যুক্ত করছেন। ঐতিহাসিকভাবে তুর্কি বিজয়ের পরবর্তী সময়ে গৌড়ে সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে, সেখানে দিল্লি সালতানাতের বিরোধী একটি বিকল্প সাংস্কৃতিক বলয় তৈরি করা হয়, ফলে গৌড় দরবারের সহযোগিতায় বাংলা ভাষায় কাব্য ও শাস্ত্রকথা রচনা শুরু হয়। যদিও পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয় আরাকান রাজসভা। তবে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রাথমিক পর্যায়ে হিন্দু কবিরা সাহিত্য ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকলেও একপর্যায়ে মুসলমান কবিরাও বাংলা ভাষায় ধর্মকথা অনুবাদে এগিয়ে আসেন। এ সময় শাস্ত্র রচনায় বাংলা ভাষা মুসলমানদের জন্য কোনো সংকট তৈরি করেনি, কিন্তু মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধি ও সমাজের প্রতিষ্ঠা দৃঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরবি শাস্ত্র শিক্ষারও প্রসার ঘটছিল। কিন্তু শাস্ত্রচর্চার ভাষা কী হবে, এ নিয়ে বাদানুবাদ চলেছে দীর্ঘদিন, 'সতেরো শতক অবধি মুসলমান লেখকেরা শাস্ত্রকথা বাঙলায় লেখা বৈধ কি-না, সে বিষয়ে নিঃসংশয় ছিলেন না।' (শরীফ ১৯৭২: ৩১১)

বহিরাগত উচ্চ শ্রেণির মুসলমান বাংলা ভাষাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারেনি, বরং বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে তাঁরা ফতোয়া দিয়েছেন। বাংলা ভাষাকে তাঁরা হিন্দুয়ানি ভাষা বলে নিন্দা করেছেন; এই হিন্দুয়ানি ভাষায় কাব্য রচনার জন্য কবিদের কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছে, এমনকি সৈয়দ সুলতানকে 'মোনাফেক' গালি শুনতে হয়েছে। যদিও সংস্কৃত কোনো শাস্ত্র-গ্রন্থে হিন্দু ধর্ম বা সম্প্রদায়ের উল্লেখ নেই, কারণ মুসলমানরাই এ দেশের মানুষ এবং তাদের ধর্মের নামকরণ করেছে 'হিন্দু'। যদিও 'সিন্ধু' শব্দটি ফারসি ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে পরিণত হয়েছে 'হিন্দু' শব্দে, যার অর্থ নির্মিত হয়েছে দাস, দস্যু, তস্কর, বাজিকর অর্থে; এখানে তাচ্ছিল্য বা ঘৃণার ভাব স্পষ্ট। জাতিকে হিন্দু বলে ডাকায় এ জাতির ভাষাও 'হিন্দুয়ানি' নাম পেয়েছে অর্থাৎ এদের ভাষাও অবজ্ঞেয়। ওই উচ্চ শ্রেণির কাছে বাংলা, যেহেতু হিন্দুর অক্ষর হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে, তাই ইসলামী কোনো বিষয় এই অক্ষরে লেখা অসংগত বলে তাঁরা মনে করেছে। এঁদের পক্ষে যুক্তি হলো—

> লিপির একাকারত্ব, ভাষার একাকারত্ব; ধর্মগত একাকারত্ব ঘটাতে পারে বলে তাঁদের দুশ্চিন্তা দেখা দেয়। চৈতন্য-পরবর্তীকালের বৈষ্ণব ধর্মমতের সঙ্গে কোন কোন মুসলিম সুফী তরিকার মিলমিশ ঘটে যে সহজিয়া বৈষ্ণব মত ও ইসলামী ফকিরী মতের উদ্ভব হয়—তা মুসলিম সমাজ ও ইসলাম ধর্মের ওপর একটা বড় আঘাত রূপেই দেখা দেয়। এর ফলে শরীয়তের কঠোর অনুসারী পীর-মাশায়েখগণ মূলের ওপর নজর দেন। তাঁরা ইসলাম-ধর্মের অপব্যাখ্যা রোধ করতে বাঙালা হরফে ইসলামী সাহিত্য না লেখার চিন্তা করেন। (এসএম লুৎফর ২০০৫: ২০৭)

একদিকে মুসলমান অভিজাত শ্রেণির বাংলা-বিরোধিতা ছাড়াও অন্যদিকে আবদুল হাকিমের উল্লেখিত জন্মস্থান অর্থাৎ নোয়াখালি বা ভুলুয়ার প্রতাপশালী জমিদার লক্ষ্মণমাণিক্য নিজে নাট্যকার ছিলেন এবং তাঁর সভাপণ্ডিত তার্কিক রঘুনাথও *কৌতুক রত্নাকর* নামে সংস্কৃত ভাষায় নাটক লিখেছেন। সেই নাটকের ভূমিকায় বলা হয়েছে—

> লক্ষ্মণমাণিক্যের রাজধানী ভুলুয়া ন্যায়াদি শাস্ত্রের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দ্বারা ভূষিত ছিল। অধিবাসীরা দেবদ্বিজে ভক্তিমান এবং সকলেই অতিথিসৎকারে উৎসুক ছিল। স্বর্গ হইতেও সমুজ্জ্বল গুণরাশি এখানে বিরাজমান। দান, ধর্ম ও যাগযজ্ঞ দ্বারা ইহা পুণ্যবানের প্রশংসনীয়

> আবাসস্থল। রাজারা জঙ্গম কল্পতরুরূপে এখানে বিরাজ করিতেছেন এবং শত শত বৃহস্পতিতুল্য শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ এখানে বিদ্যমান। (রাজিয়া ১৯৮৭: ১৮)

এই ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুদের মধ্যেও বাংলা ভাষার বিরোধিতা বিদ্যমান ছিল, কারণ সেন আমল থেকেই উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি বিকাশের জন্য শূদ্রের শিক্ষাগ্রহণ বা সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষার চর্চা নিষিদ্ধ ছিল এবং বাংলাদেশের অধিবাসীদের তারা ম্লেচ্ছ, দস্যু, পাপ প্রভৃতি অবজ্ঞাসূচক বিশেষণে অভিহিত করেছে। এ ছাড়া ব্রাহ্মণ্যবাদীরা ঘোষণা করেছিল, 'অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ। ভাষায় মানব শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥' অর্থাৎ আঠারো পুরাণ এবং রামচরিত মানব ভাষায় শ্রবণ করলে রৌরব নরকে গমন করতে হবে। তাই মালাধর বসু বলেছেন, 'পুরাণ পড়িতে নাই শূদ্রের অধিকার।/ পাঁচালী পড়িয়া তর এ ভব সংসার॥' ফলে নিম্নবর্গের হিন্দু শাস্ত্রকথা ও লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্য বাংলা ভাষায় শ্রবণ করেছে, যদিও এগুলো রচনার সঙ্গে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ শ্রেণিও যুক্ত ছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা এর বিরোধিতা করেছে, কারণ মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত শাস্ত্র বাংলা ভাষায় অনূদিত হতে থাকে, এতে সংস্কৃত ভাষার আধিপত্য বিলোপ হতে থাকে, ভাষা-জ্ঞান-শাস্ত্র সাধারণের আয়ত্তে আসতে থাকে। তবে—

> অনুবাদ লিপিবদ্ধ করাতেই ছিল আপত্তি। যুক্তি ছিল ঐশীবাণীর পবিত্রতা, গুরুত্ব, মূল্য, মর্যাদা এবং সর্বোপরি ক্রিয়াশক্তি নষ্ট হয়, ফলে ঈশ্বর রুষ্ট হন, পাপ বাড়ে প্রজার। আসলে সেকালের নিরক্ষর অজ্ঞেয় সমাজে পুরোহিতবর্গের শ্রেণীস্বার্থে শাস্ত্রের একাধিপত্য রক্ষার এবং সমাজে প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা স্থায়ী রাখার উপায় হিসেবে বিদ্যার ও জ্ঞানের প্রসাররোধ এবং পেশাগত প্রয়োজনে সম্পদ অর্জন লক্ষ্যে মন্ত্রগুপ্তিই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য। (শরীফ ২০১৪: ৩০০)

হিন্দুদের দেবভাষার সংস্কার থেকেই মুসলমানদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যচেতনা প্রবল হয়, তাই তারাও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, 'ভাষান্তরিত হলে আয়াতের মহিমা ও পবিত্রতা নষ্ট হয়' (শরীফ ১৯৭২: ৩০৯)। সেজন্য আরবি-ফারসি কিতাব বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা মহাপাপের কাজ। এই প্রচারণা মুঘল শাসনামলে তীব্রতা লাভ করে এবং দিল্লিকেন্দ্রিক এই শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে রাজভাষা ফারসির আধিপত্যকামী চারিত্র্য প্রকাশিত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ের মুসলমান শাসকেরা বাংলা ভাষার প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন রাজনৈতিক প্রয়োজনেই। যাদের শাসন করা হবে, তাদের সম্পর্কে জ্ঞানার্জন জরুরি ছিল, সেই জানার প্রয়াস এবং নিজেদের মতাদর্শ প্রচারের ভাষা হিসেবে অধস্তনের ভাষাকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ফারসি ভাষার আধিপত্য দেখা দিলেও, সে ভাষা ব্যাপকভাবে জনসমাজে প্রবেশ করতে পারেনি। কারণ—

> আরবী-ফারসী ভাষায় চর্চা হলেও তখন পর্যন্ত তা আভিজাত্যের পরিচায়ক বলেই বিবেচিত হতো এবং এ কারণেই আরবী-ফারসী চর্চা ব্যাপকতা লাভ করেনি। ফারসী সাহিত্য এ দেশের মানুষের মনের রস-পিপাসা চরিতার্থ করেছে সত্য, কিন্তু তা ব্যাপক ও বিস্তৃত রূপ গ্রহণ করে মনোবিকাশের ধারায় কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেনি। (মাহফুজউল্লাহ ২০০৪: ২৮)

অতএব, একদিকে ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃত শাস্ত্র-চর্চার রাজকীয় পরিবেশ, আবার অন্যদিকে অভিজাত মুসলমানের আরবি-ফারসি ভাষা-চর্চার রমরমা পরিবেশে হাকিম নিজেকে আবিষ্কার

করেছেন। লক্ষ্যণীয় বিষয়, ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতি ও মোগল সংস্কৃতি উত্তরভারত হয়েই বাংলায় প্রবশ করে এবং এই দুই সংস্কৃতিই বাংলা ভাষায় শাস্ত্রচর্চার বিরোধী। এরা বিভিন্ন জন বিভিন্ন নামে এই ভাষাকে অভিহিত করেছেন—

> উন্নাসিক ব্রাহ্মণ অভিজাতদের কাছে বাঙলা ছিল 'ভাষা', উন্নাসিক মুসলিমদের কাছে 'হিন্দুয়ানি ভাষা', কারুর চোখে 'প্রাকৃত ভাষা', কারো মতে 'লোক ভাষা', কেউ বলেন, লৌকিক ভাষা', অধিকাংশ লেখক 'দেশীভাষা' এবং কিছু সংখ্যক লেখক 'বঙ্গভাষা' বলে উল্লেখ করতেন। বহিরাঞ্চলে এ ভাষার নাম ছিল 'গৌড়িয়া'। (শরীফ ১৯৭২: ৩১১)

ফলে হাকিম এই উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির আগ্রাসনের গতিরোধ করেছেন, বাংলা ভাষায় শাস্ত্র রচনাকে বৈধতা দানের পক্ষে অবস্থান নিয়ে। তাই বলে হাকিম অন্য ভাষা জানতেন না এমন নয়, তাঁর কাব্যগ্রন্থ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—

> কবি আরবী, ফারসী ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন। তিনি শুধু ভাষাবিদই ছিলেন না, বিভিন্ন শাস্ত্রে তিনি বিশেষ পাণ্ডিত্যও অর্জন করেছিলেন। হাদিস, কুরআন, হেদাআ, কাফিয়া, ফেকাহ প্রভৃতি আরবী গ্রন্থ এবং বিভিন্ন শাস্ত্র তাঁর অধীত ছিল। ফারসী কাব্যের মধ্যে তাঁর পঠিত গ্রন্থ *নূরনামা, দুররুল্ল মজলিশ, ইউসুফ ওয়া জুলায়খা, তোহফা, সিকান্দারনামা* প্রভৃতি। সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে *রামায়ণ-মহাভারত* পুরাণাদি, *অভিজ্ঞান শকুন্তলম, কুমার-সম্ভব* প্রভৃতি তাঁর পঠিত ছিল। (রাজিয়া ১৯৮৭: ৪৯)

তথাপি আবদুল হাকিম জনসমাজের ভাষায় শাস্ত্রকথা প্রচারের পক্ষে অবস্থান নিয়ে বিরোধীদের তীব্রভাবে কটাক্ষ করেছেন তাঁর কাব্যে। অর্থাৎ আবদুল হাকিমকে এমন এক অবস্থানে দেখা যাচ্ছে, যেখানে তিনি একইসঙ্গে হিন্দু সামন্ত-পুরোহিত ব্রাহ্মণ শ্রেণি এবং আভিজাত্যগর্বী আশরাফ মুসলমান শ্রেণির সঙ্গে দ্বন্দ্বে রত। এই দ্বন্দ্বের জায়গাটা মূলত কাব্য রচনা নয়, বাংলা ভাষায় ধর্মশাস্ত্র রচনা বা অনুবাদ প্রসঙ্গে। আর এক্ষেত্রে যখন তিনি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন, সেই প্রতিক্রিয়া শুধু বাংলা ভাষার বিরোধীদের প্রতি নয়, বরং বাংলা ভাষায় জ্ঞান ও বৌদ্ধিক চর্চার বিপরীতে যাঁরা জ্ঞানকে কুক্ষিগত করে রাখতে চান, তাঁদের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ। আর এই প্রতিবাদের মধ্য দিয়েই তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে যান এবং এই জায়গায় তিনি হয়ে পড়েন এক সত্যনিষ্ঠ, দুঃসাহসী বুদ্ধিজীবী। অতএব এক বিশেষ বাস্তবতায় আবদুল হাকিম বুদ্ধিজীবী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন, এই পরিস্থিতিতে তৎপরতার নিরিখে হাকিমের বুদ্ধিজীবিতার ক্ষেত্র চিহ্নিত করা যেতে পারে।

৪

আবদুল হাকিমের বিভিন্ন রচনা বিশ্লেষণসূত্রে, কাব্য রচনার উদ্দেশ্য, সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার, বাংলা ভাষায় প্রকাশের মাধ্যমে বিদেশি ভাষায় রচিত ধর্মশাস্ত্রের জ্ঞানকে সর্বসাধারণের জন্য মুক্ত করা এবং আধিপত্যশীল কাঠামোর বিকল্প হিসেবে পিরবাদী কাঠামোর প্রস্তাব প্রভৃতি ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবী হিসেবে তাঁর তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায়।

৪.১

মধ্যযুগের বেশির ভাগ কবিই রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় কাব্য রচনা করেছেন এবং কবি তাঁর কাব্যে পৃষ্ঠপোষকের স্তুতিবচন উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। আদেষ্টা হিসেবেও পৃষ্ঠপোষকের গুণকীর্তন করেছেন অনেকে। কিন্তু হাকিমের কাব্যে কোনো রাজ্যের বা রাজার এবং পৃষ্ঠপোষকের প্রশংসাসূচক বর্ণনা অনুপস্থিত। এর পরিবর্তে তাঁর কাব্যে দেখা যায়—

> শুনিতে ফারসী ভাষে অন্য জন মুখে।
> ভালোমতে বুঝিতে না পারি মন সুখে॥
> তেকাজে নিবেদি বাঙ্গালা করিআ রচন।
> নিজ পরিশ্রমে তোষি আহ্মি সর্ব্বজন॥
> (আবদুল হাকিম ১৯৮৯: ৪৭১)

এতে বোঝা যায় হাকিম কোনো রাজসভার কবি ছিলেন না, ফলে রাজসভার মনোরঞ্জনের আয়োজনের দায়ও তাঁর ছিল না। বরং সাধারণ মানুষ যারা শাস্ত্রকথা শুনতে চায় তাঁদের সন্তুষ্টির জন্য হাকিম কাব্য রচনা করেছেন। সামন্ত যুগে, দরবারের কাছে থেকেও আবদুল হাকিম দরবারি কবি ছিলেন না, এই না থাকাটাই তাঁকে অনেক বেশি জনঘনিষ্ঠ করেছে। তিনি তাঁর কাব্য রচনার কারণ হিসেবে বলছেন—

> কিতাব পড়িতে যার নাহিক অভ্যাস।
> সে সকল ইষ্ট মিত্র আসি মোর পাশ॥
> কহিলা গৌরব ভাষে করুণা বচন।
> পরিশ্রমে তুষি আহ্মি সভানের মন॥
> নূরের সৃজন কাব্য করি বঙ্গভাষা।
> রচি আমি সভানের পূর্ণ করি আশা॥
> (আবদুল হাকিম ১৯৮৯: ৪৭১)

এখানে হাকিমের পৃষ্ঠপোষক সাধারণ মানুষ। অর্থাৎ ক্ষমতাকেন্দ্র কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে নয়, বরং ইসলাম প্রচার এবং সাধারণ বাঙালি মুসলমান সমাজের শিক্ষা-সংস্কারের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে তিনি কাব্য রচনা করেছেন। মুসলমান জনসমাজের রস-রুচি অনুযায়ী বিষয়কে তিনি কাব্যাঙ্গিকে ধারণ করেছেন এবং সমাজের জীবনযাপন পদ্ধতির নানা দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। বিশেষ করে তাঁর *দুররে মজলিশ* সাধারণ মুসলমান জনসমাজের জন্য নীতিশিক্ষামূলক কাব্য, এর আরেক নাম *নসিহত নামা*। এ ছাড়া তাঁর সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক *নূরনামা* এবং প্রণয়োপাখ্যান প্রভৃতি গ্রন্থে ধর্মীয় শাস্ত্রানুগ জীবনযাপন পদ্ধতির উপস্থাপন ঘটেছে। হাকিম এর মধ্য দিয়ে ইসলামের ধর্মীয় জ্ঞান সাধারণ মানুষের মধ্যে পৌঁছে দিয়ে মুসলমান সমাজের জীবনদর্শন ও মূল্যবোধ সৃষ্টিতে প্রয়াসী হয়েছেন।

৪.২

একদিকে জনসমাজের সঙ্গে সংযুক্তি আবদুল হাকিমকে বুদ্ধিজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এদিক থেকে তিনি পেশাদার বুদ্ধিজীবী না হওয়ায় স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশ এবং প্রতিবাদ করতে সক্ষম হয়েছেন। থিবো দুব্যের বলেন, 'Abdul Hakim is certainly the most self-aware rural author of eastern Bengal.' (2018: 41)। আবার অন্যদিকে আবদুল হাকিম তাঁর পাঠককে যে জ্ঞান অর্জনের তাগিদ দিচ্ছেন, এর উৎস হিসেবে তিনি ইসলাম

ধর্মীয় শাস্ত্র-গ্রন্থকেই নির্দেশ করছেন। অতএব ধর্মীয় বোধ থেকেও বুদ্ধিজীবী তৈরি হতে পারে, আবদুল হাকিম এক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বিদ্যমান চিন্তাকাঠামোর সঙ্গে সাংস্কৃতিক মোকাবিলার মধ্য দিয়েই তাঁকে চলতে হয়েছে, এই মোকাবিলার মধ্যে বিরোধ আছে, সমন্বয়ও আছে। একদিকে তাঁর প্রণয়কাব্য রচনার উদ্দেশ্য পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, *ইউসুফ-জলিখা* তাঁর অনুবাদ কাব্য, *লালমোতি সয়ফুলমুলক* নির্দিষ্ট কাব্যের অনুবাদ না হলেও রোমান্সধর্মী রূপকথা এবং প্রণয়োপাখ্যানের মিশ্রণে প্রণীত কাব্য। প্রণয়োপাখ্যানের ইতিহাসে দেখা যায়, অধিকাংশ প্রণয়োপাখ্যানই রাজদরবারের সভাসদদের পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধ্যের উপযোগী করে রচিত। কিন্তু হাকিম প্রণয়োপাখ্যান রচনার মাধ্যমে একদিকে সাধারণ মুসলমান সমাজের রস-রুচির চাহিদা পূরণে প্রয়াসী হয়েছেন, অন্যদিকে দরবার-বহির্ভুত কবি হিসেবে তাঁর যে কাজ অর্থাৎ ধর্মীয় জ্ঞানের প্রচার, সেটিও সম্পন্ন করেছেন।

হাকিমের অভিজ্ঞতায়, তুর্কি বিজয়ের পূর্বের এই অঞ্চলের মানুষের ধর্মকে হিন্দু ধর্ম, ভাষাকে 'হিন্দুয়ানি' বা হিন্দুর অক্ষর বলে হিন্দুদের অপরায়ণের একটি কাঠামো দাঁড় করানো হয়ে গিয়েছিল। আহমদ ছফা এই সময়ের প্রবণতা সম্পর্কে বলেন, 'কাফের এবং হিন্দু, পুঁথিলেখকের কাছে অনেকটা সমার্থক। অনেক সময় কাফের বলতে হিন্দু এবং হিন্দু বলতে কাফের ধরে নিয়েছেন' (২০১৮: ২৩)। প্রসঙ্গত আবদুল হাকিম নিজেও এই অপরায়ণ-প্রবণতার বাইরে নন, হিন্দু মাত্রই কাফের এই চিন্তা হাকিমেরও ছিল। *দুররে মজলিশ* কাব্যে মূর্তিপূজার অসারতা প্রমাণ করতে তিনি জনৈক বৃদ্ধ এবং তার অসুস্থ পুত্রের যে কাহিনি উপস্থাপন করেছেন, সেখানে হাকিম বলছেন—

> আছিল কাফির এক বৃদ্ধ কলেবর।
> পূজিতে আছিল মূর্তি সত্তর বছর॥
> (আবদুল হাকিম ১৯৭৮: ৪৪৫)

এ ছাড়া তাঁর সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম বেশ প্রভাবশালী ছিল, তাই প্রথম রচনা *ইউসুফ-জলিখা* কাব্যে তিনি বৈষ্ণব ধর্ম-সংস্কৃতির সমালোচনা করেছেন। এখানেও তিনি কাঠামো থেকে বের হতে পারেননি। তাই কৃষ্ণ চরিত্রের বিপরীত চরিত্র হিসেবে ইউসুফের চরিত্রায়ণ করেছেন। থিবো বলেন—

> Another aspect of Hakim's text that connects him to the neighboring authors of Chittagong is the moralistic tone of his oeuvre and his critique of Vaisnavism. Like that of Saiyad Sultan, the focus of his critique of Vaisnavism is on sexual continence and avoiding adultery [paradara]. In Isuph Jalikha, he treated this subject in a narrative way by transforming the prophet Yusuf into an anti-Krishna; he takes on a more straightforward and didactic attitude toward the topic in a work (adapted from the Persian) titled Durre Majlis. (2018: 41)

ইউসুফ এবং সয়ফুলমুলক দুই নায়ককেই কৃষ্ণের বিপরীতে দাঁড় করিয়েছেন তিনি। পরকীয়া প্রেমের যে বয়ান এ দেশে উপস্থিত আছে তা বাতিল করার জন্যই এসব নায়কের নির্মাণ ঘটিয়েছেন, এমন ভাবনা অসংগত নয়। পরকীয়া প্রেম-বিরোধী স্বকীয়া প্রেমের আখ্যান শুনিয়ে তিনি দুটি কাজ করেছেন, একদিকে জনসমাজের প্রণয়কাহিনি শোনার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত করেছেন, অপর দিকে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও পুরুষের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সংযমের প্রতি গুরুত্ব

আরোপ করেছেন। আবার আদি রসাত্মক প্রণয়োপাখ্যানের দেশে শৃঙ্গার রসকে পাশ কাটিয়ে হাকিম আধ্যাত্মিক আশেক-মাশুক তত্ত্বের অবতারণাও ঘটিয়েছেন। তবে তিনি জলিখার উদগ্র বাসনার সামনে ইউসুফের সংযম এবং সয়ফুলমুলকের দুঃসাহসিক অভিযাত্রাকে প্রেমের সাধনা হিসেবে চিত্রিত করেন এবং এর বিপরীতে পরদার গমনের ভয়াবহতা দেখিয়ে মানুষকে সেই কাজে নিরুৎসাহিত করেন। তিনি বলেন, 'পরধন পরনারী লোভে যার মন।/ ইহলোকে পরলোকে অবশ্য লাঞ্ছন॥" (১৯৮৯: ২৮০)। অর্থাৎ হাকিম সমাজের শৃঙ্খলা বিধানের প্রয়াসী হয়েছেন। তিনি রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার বিপরীতে ইউসুফ-জোলেখার প্রণয়কাহিনির মধ্যে জ্ঞান সঞ্চারিত করে দিয়েছেন, তিনি বলেন—

> তে-কারণে মহব্বতনামা রাখিলুঁ নাম।
> রচিলুঁ পুস্তক প্রেম-বন্ত অনুপাম॥
> ইসুফ জলিখা দোঁহে মনহিত বাণী।
> কলমে লিখিলুঁ জান অপূর্ব কাহিনী॥
> ধড়ে সাঞ্চারিল জেবা ছিল জ্ঞান-ধন।
> নিকলি করিলুঁ ব্যক্ত শুন গুনীগণ॥
> (আবদুল হাকিম ১৯৮৯: ২)

বিরোধিতার অন্যদিকে আবার সমন্বয়ের প্রয়াসও আছে এর মধ্যে। তিনি ইউসুফ-জোলেখার প্রেমের তুলনা দেওয়ার জন্য বাঙালির স্মৃতিতে জাগ্রত রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের ইতিহাসকেও পুনরুজ্জীবিত করেছেন এই সুযোগে। পাশাপাশি এ দেশীয় নৈষধ-দময়ন্তী, বিদ্যা-সুন্দর, অনিরুদ্ধ-উষার প্রেমের প্রসঙ্গও এসেছে। এ ছাড়া *নূরনামায়* যে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা করেছেন, তাতে হিন্দু-পৌরাণিক ঐতিহ্যও সাঙ্গীকৃত হয়ে উঠেছে। স্রষ্টার নূর থেকে নবির নূর সৃষ্টি হওয়ার এই আখ্যানে আয়েশা ইরানি ভারতীয় অবতারবাদের প্রভাব স্পষ্ট দেখেছেন। এ ছাড়া হাকিম অহংকারী ব্যক্তির পরিণাম বর্ণনা করতে গিয়ে আজাজিল, নমরুদ, ফেরাউন, কারুন, শাদ্দাদ ও এজিদের সঙ্গেই পৌরাণিক চরিত্র বালী ও রাবণের নাম উচ্চারণ করেন। তিনি বলেন—

> নিজবল পুত্রবল সৈন্যবল জানি।
> সমুদ্র বেড়িছে লঙ্কা গর্ব অনুমানি॥
> না রাখি আল্লার ভয় রাবণ দুর্মতি।
> মনগর্বে হরি নিল পরের যুবতী॥ ...
> পরনারী প্রতি লোভ মহা পাপ হএ।
> সেহি পাপে রাবণের দশ মুণ্ড ক্ষয়॥
> (আবদুল হাকিম ১৯৮৯: ৪২০)

অর্থাৎ যে গল্প পুরুষ-পরম্পরায় বাঙালি শুনে এসেছে, হাকিম *রামায়ণের* সেই গল্পকেই দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহার করেছেন মুসলমানদের উদ্দেশ্যে। এ ছাড়া অহংকারী-পাপীর শাস্তির কথা যে সকল ধর্মশাস্ত্রেই বলা আছে, সেই নীতিকথাও তিনি প্রচার করছেন।

৪.৩

যে জনসমাজের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, সেই জনসমাজকে প্রভাবিত করতে হাকিম জ্ঞানের প্রসার বেগবান করতে প্রয়াসী হয়েছেন এবং জ্ঞান অর্জনকেই তিনি জীবনের প্রধান লক্ষ্য মনে করেন। শাস্ত্র-গ্রন্থসমূহ সেই জ্ঞানের উৎস, জ্ঞান সেখানে গূঢ়রূপে প্রচ্ছন্ন থাকে, যা কেবল বৌদ্ধিকভাবেই উপলব্ধি করতে হয়। হাকিম বলেন, 'গোপত বেকত প্রভু আদ্য পরিমাণ।/ কোরান আদেশ হেন আছএ প্রধান॥/ ভেদভঙ্গ এ সকল বাক্য অনুচিত।/ গুণী আগে ব্যক্ত হয় ভেদের ইঙ্গিত॥' (১৯৮৯: ১৩৭)। অর্থাৎ শাস্ত্র উপলব্ধি বৌদ্ধিক ব্যাপার এবং তা পাঠের মাধ্যমে মানুষের আত্মসচেতনতা তৈরি হয়। কেননা শাস্ত্রের অভিভাবক কর্তৃত্ববান শ্রেণি জ্ঞানকে কুক্ষিগত করে রাখতে চায় এবং ধর্মশাস্ত্রকে নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে তারা মানুষের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের জন্য হাকিম জ্ঞানকে মুক্ত করতে উদ্যোগী হয়েছেন। তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে জ্ঞানচর্চার স্পৃহা জাগ্রত করে সে ধারাকে সর্বজনীন করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তাই হাকিম আহ্বান জানাচ্ছেন, 'এলেম প্রদীপে নাশ ঘর অন্ধকার।/ জনম বিফল হএ প্রিথিম্বি মাঝার॥' (১৯৮৯: ৪১১)। এ ছাড়া এলেম বা জ্ঞানের পরিচয় এবং এর প্রায়োগিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি *নূরনামায়* বলেন—

প্রথম সমুদ্র হএ এলেম প্রধান।
এলেম প্রচণ্ড যাক বুলি শুদ্ধ জ্ঞান॥
ভাল অনুমানে বুঝে ভাল তত্ত্ব সার।
ভাল কর্মজ্ঞাতা হই ভাল ব্যবহার॥
জ্ঞানের সমুদ্রে মজি সাধে ধর্ম জ্ঞান।
তবে সে হৈতে পারে সাধু মতির্মান॥
(আবদুল হাকিম ১৯৮৯: ৪৭৩)

শিক্ষিত পাঠক শ্রেণি শুধু নয়, অক্ষরজ্ঞানহীনরাও হাকিমের প্রকল্পের বাইরে থাকে না। যারা পড়তে পারে না, তাদের অন্তত শ্রবণের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের নির্দেশনা দেন তিনি। তাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'পড়িতে না পারে যবে/ পড়ুয়া আনিআ তবে/ শুনিবা না হৈব মতি ভোর' (১৯৮৯: ৪৮৭)। অর্থাৎ জ্ঞানকে সর্বজনীন করাই হাকিমের উদ্দেশ্য, এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্যবাদী শ্রুতি ও শাস্ত্রের পরম্পরা অনুসরণের পক্ষপাতী তিনি।

হাকিম যে জ্ঞান অর্জন এবং উপলব্ধির প্রতি জোর দেন, সেই জ্ঞান ইসলাম ধর্মীয় জ্ঞান এবং ওই জ্ঞানের উৎস নির্দেশ করে তিনি বলেন—

আরবি পড়িয়া বুঝ সাস্ত্রের বচন।
জতেক এলেম মৈদ্ধে আরবি প্রধান॥
আরবি পড়িতে যদি না পার কদাচিত।
ফারছি পড়িয়া বুজ পরিনাম হিত॥
ফারছি পড়িতে জদি না পার কদাচিত।
নিজ দেসী ভাসে সাস্ত্র পড়িতে উচিত॥
আরবি এলম জান সাস্ত্র মোছলমানি।
জতেক এলেম মৈদ্ধে আরবি বাখানি॥
ফারছি এলেম হএ আরবি তনএ।
আরবি অনুরূপ ফারছি লিখএ॥
হিন্দু সাস্ত্র পুস্তক জে ফারছির নন্দন।

পুস্তক লিখএ ফারছির বিবরন॥
এ তিন এলেম মৈদ্ধে এক নাহি জার।
নিশ্চএ তাহার দিন ঘোর অন্ধকার॥
(আবদুল হাকিম, ১৯৮৯: ৪১২)

'হিন্দু শাস্ত্র-পুস্তক'কে কবি ফারসির নন্দন বলেছেন, কারণ আরবি ভাষা থেকে ইসলামী শাস্ত্র প্রথমে ফারসি ভাষায় অনূদিত হয়েছে, তারপর পারস্য হয়ে তা এ দেশে পৌঁছে বাংলা ভাষায়—হিন্দুয়ানি ভাষায়—অনূদিত হয়েছে। ভাষান্তর হলেও বক্তব্য অভিন্ন থেকেছে, তাই হাকিম সেই দিকে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। পাঠককে তিনি আরবি পড়তে উৎসাহিত করেছেন, আরবি না জানলে ফারসি পড়তে বলেছেন, এমনকি কেউ যদি ফারসিও না জানে তাকে মাতৃভাষায় জ্ঞানচর্চা করতে উৎসাহিত করেন। অর্থাৎ দেশি ভাষায় শাস্ত্রচর্চার ক্ষেত্রে হাকিমের যতটা না ভাষাপ্রীতি, তার চেয়ে বেশি জ্ঞান-বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। তবে, ইসলামী জ্ঞান ও দর্শন 'হিন্দুয়ানি' অক্ষরে প্রকাশ করা এবং অনুধাবন করাকে তিনি পাণ্ডিত্যের লক্ষণ বলে মনে করেন। তিনি বলেন—

হিন্দুয়ানী অক্ষরে বয়নে মুসলমানী।
লিখিআ বুঝিল তত্ত্ব পণ্ডিত বাখানি॥
অক্ষরে অধিকাধিক নাহি কদাচিত।
শাস্ত্র উপদেশ বাক্য জানিতে উচিত॥
(আবদুল হাকিম ১৯৮৯: ৪৭২)

তাঁর মতে, ফারসি ভাষায় বিভিন্ন জ্ঞানগর্ভ শাস্ত্র লিখিত হয়েছে, কিন্তু পাঠের পর যদি জ্ঞানের উপলব্ধি না ঘটে, তাহলে তা ফলপ্রসূ হতে পারে না। আবার যেহেতু জ্ঞানচর্চা ও বৌদ্ধিক বিচার-বিশ্লেষণ মাতৃভাষা ছাড়া সর্বাত্মকভাবে প্রকাশ করা যায় না, তাই জ্ঞানের বিস্তার ঘটানোর জন্য হাকিম অবলম্বন করেন সাধারণের ভাষা। এক্ষেত্রে হাকিম ধর্মগ্রন্থের মূলবক্তব্যকেই অনুসরণ করেন এবং তিনি শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকারী হিসেবেই নিজেকে উপস্থাপন করেন। যাদের জন্য তিনি লিখছেন, সেই জনসাধারণের কাছে আরবি-ফারসি ভাষা যে অপরিচিত, তার প্রমাণ পাওয়া যায়, যখন হাকিম বিভিন্ন আরবি-ফারসি শব্দের বাংলা সমার্থশব্দ উল্লেখ করেন। যেমন: 'লা ইলাহার অর্থ কহি শুন নরগণ। নাহিক দোসর কেহ বিনি নিরঞ্জন॥' (আবদুল হাকিম ১৯৮৯: ৪৮৩)। শুধু তাই নয়, হাকিম তাঁর পাঠকের অভিজ্ঞতায় থাকা হিন্দু পৌরাণিক দেবতার প্রতিস্থাপন করছেন আরবি শব্দের মাধ্যমে; যেমন: 'বাদ/পবন/বাতাস, ব্রহ্মা/আনল/হতাশ, বরুণ/আব/জল, খাক/ধরণী/অটল' (আবদুল হাকিম ১৯৮৯: ৪৭৮)। যেহেতু ধর্মকথা নিজের ভাষা ছাড়া সম্যক উপলব্ধি করা দুরূহ, তাই যারা প্রজন্মান্তর ধরে বাংলার আলো-হাওয়ায় বাস করছে, দৈনন্দিন জীবন দেশি ভাষায় যাপন করছে, তারা ভাষাগত দূরত্বের কারণে সেসব শাস্ত্রকথা বুঝতে পারে না। অথচ তারা ধর্মকথা পড়তে ও শুনতে চায়, তাই তাদের সে আগ্রহ পূরণের জন্য হাকিম উদ্যোগ নিয়েছেন।

আবদুল হাকিম কর্তৃক মুসলমান সমাজে নৈতিকতার বিস্তার ও সমাজের শৃঙ্খলা বিধান-প্রচেষ্টায় জ্ঞানের প্রসার ঘটানোর মধ্যে ইহলৌকিক বুদ্ধিজীবিতার ছাপ স্পষ্ট। এক্ষেত্রে হাকিম আধিপত্যবাদী ধর্মতত্ত্বীয় কাঠামোর বাইরে গিয়ে বোঝার প্রয়াস নিয়েছেন, শাস্ত্র নিজেই অর্থ ধরে রাখে নাকি মানুষ শাস্ত্রকে অর্থ প্রদান করে। তিনি এই প্রশ্নের উত্তর লাভ করেছেন

ধর্মীয় কাঠামোর পরিবর্তে সামাজিক জীবনযাপন-পদ্ধতিতে প্রযুক্ত ধর্মীয় জ্ঞানের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে শুধু ভাষার কাঠামো চর্চার বিরোধিতা করে ভাষায় প্রকাশিত জ্ঞানের উপলব্ধিই তাঁর অভীষ্ট।

ধর্মের সঙ্গে ভাষার যে কোনো সম্পর্ক নেই, হাকিম তা বেশ জোর গলায় উচ্চারণ করেন। কারণ, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ধর্মের পরিভাষা বদলে গেলেও মূলবক্তব্যে বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় না। এক্ষেত্রে হাকিম কোরান-হাদিসের আলোকেই ভাষা বিষয়ক দ্বন্দ্বের নিরসন করতে উদ্যোগী হয়েছেন। আর এ প্রসঙ্গে অক্ষর বুঝতে পারার পাশাপাশি অর্থ উপলব্ধির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে হাকিম জড়িয়ে পড়েন দীর্ঘকাল ধরে চলা বাঙালি মুসলমানের শাস্ত্রচর্চার ভাষা বিষয়ক সেই ঐতিহাসিক বিতর্কে। কারণ মধ্যযুগেই মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় আশরাফ ও আতরাফ নামের দুই স্তরে বাঙালি মুসলমান সমাজ বিভক্ত হয়ে যায়। বহিরাগত সৈয়দ, শেখ, মোগল, পাঠান ও উচ্চ বর্ণের ধর্মান্তরিত হিন্দুরা নিজেদের আশরাফ বা সম্ভ্রান্ত হিসেবে গণ্য করে, স্থানীয় মোল্লা ও মাওলানাগণ এঁদের সাথে জোট বেঁধে 'হিন্দুয়ানি ভাষা'র বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে আবদুল হাকিম আরবি-ফারসি ভাষার প্রতি তাঁর ঐকান্তিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেও, বাংলা ভাষায় শাস্ত্র রচনার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন। সাধারণত শাস্ত্রের অভিভাবকেরা ভাষা ও টেক্সটের মধ্যে অর্থকে আবদ্ধ বলে ঘোষণা করে এবং অন্য ভাষায় তার চর্চা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। তাই অভিজাত মুসলমান শ্রেণি যখন বাংলা ভাষায় শাস্ত্র প্রচারের বিরোধিতায় মত্ত এবং তার সপক্ষে নানা যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করেছে, আবদুল হাকিম তাদের সেই যুক্তি খণ্ডন করেছেন। এক বিশেষ বাস্তবতায় তিনি ভুল ব্যাখ্যার প্রতিবাদ জানিয়েছেন জোরালো ভাষায় এবং সত্য উন্মোচন করে পালটা যুক্তি দাঁড় করিয়েছেন। হাকিম অর্থ না বুঝে শাস্ত্রপাঠকারীদের অন্ধ বলে গালি দিয়েছেন, তবে এই প্রতিক্রিয়া জানানোর মধ্যেই তিনি তাঁর দায়িত্ব শেষ করেন না, তিনি বিকল্প প্রস্তাবও রাখেন। এক্ষেত্রে তিনি সমস্যাটি ব্যাখ্যা করেন, অর্থাৎ আরবি-ফারসির পরিবর্তে বাংলায় কেন শাস্ত্র পাঠ করা যেতে পারে তা বিচার-বিশ্লেষণ করেন, তিনি বলেন—

যেহি দেশে যেহি বাক্য কহে নরগণ॥
সর্ব বাক্য বুঝে প্রভু কিবা হিন্দুয়ানী।
বঙ্গ দেশী বাক্য কিবা যথ ইতি বাণী॥
যার যেবা নিজ বাক্য প্রভু আরাধএ।
পদুত্তর দেন্ত প্রভু আপনে লক্ষ্যএ॥
(আবদুল হাকিম ১৯৮৯: ৪৭২)

এ ছাড়া আধিপত্য সৃষ্টির জন্য উচ্চ শ্রেণি অধস্তনের ইতিহাস, ভাষা, সংস্কৃতি সম্পর্কে হীনম্মন্যতার বোধ তৈরি করে তা ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। এখানেও মাতৃভাষাকে ভুলিয়ে আরবি-ফারসি অনুপ্রবিষ্ট করার প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের ইতিহাস-ঐতিহ্য, ভাষা-সংস্কৃতি ভুলিয়ে দেওয়ার যে অপকৌশল চলছিল, সেখানে হাকিম মানুষের ভুলে যাওয়া বিষয় মনে করিয়ে দিতে প্রয়াসী হয়েছেন। তিনি বলেন—

মাতাপিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মন হিত অতি॥
না বুঝি আরবী বাক্য না চিনি অক্ষর।

তেকাজে আশ্বাস মনে ভাবি বহুতর॥
নিজ দেশী ভাষা করি গৃহতে সকল।
আক্ষি সব আগে কর সংকট কুশল॥
(আবদুল হাকিম ১৯৮৯: ৪৭২)

হাকিম এটাও স্মরণ করিয়ে দেন, স্থান-কাল-পাত্রের ভাষিক পার্থক্যের কারণেই ঐশীগ্রন্থসমূহ ভিন্ন ভিন্ন নবীর কাছে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। এতে ভাষাগত ভিন্নতা থাকলেও, 'আল্লা খোদা গোঁসাই সকল তান নাম'। এর মধ্য দিয়ে হাকিম বাংলাদেশে ইসলামের ধর্মীয় জ্ঞানকাণ্ডের বিকাশের পর্যালোচনা ও তর্কবিতর্কের পথ তৈরি করেন। বিশেষ দেশ-কাল-পাত্রে ধর্মের ধ্বজাধারীরা যে প্রশ্ন উত্থাপন করে, হাকিম তার পর্দা সরিয়ে দিয়েছেন। ধর্মের বিরুদ্ধে নয় বরং ধর্মধ্বজীদের হাত থেকে মানুষের ধর্মকে মুক্ত করতেই তাঁর এই উদ্যোগ।

হাকিমের বক্তব্য অনুযায়ী অক্ষর বা শব্দের মধ্যে অর্থ বা জ্ঞান আবদ্ধ নয়, বরং জ্ঞান নিহিত বোঝাপড়ার মধ্যে। তাই শাস্ত্রচর্চায় যারা বঙ্গবাণী বা হিন্দুর অক্ষরকে হিংসা করে বা বিরোধিতা করে, হাকিম তাদের দেশ ছেড়ে যাওয়ার তাগিদ দেন। অবশ্য হিংসা শব্দের আরেকটি অর্থ 'হত্যা করা'ও বোঝায়। তাই বাংলার পরিবর্তে যারা অন্য ভাষার চর্চা করতে চায়, হাকিম তাদের উৎসাহিত করেন; কারণ 'আরবী ফারসী শাস্ত্রে নাই কোন রাগ।/ দেশী ভাষা বুঝিতে ললাটে পুরে ভাগ॥' কিন্তু যারা বাংলা ভাষার বিকৃতি ঘটাতে চান, তাদের প্রতি তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। আর সাধারণত ভাষায় ব্যক্ত জ্ঞান ও দর্শন সম্পর্কে যারা না-ওয়াকিবহাল, তারাই ভাষা-বিতর্ক তৈরি করে, হাকিম এদের প্রতিই আক্রমণ শানিয়েছেন এবং বিক্ষুব্ধ হয়েছেন—

মারেফাত ভেদে যার নাহিক গমন।
হিন্দুর অক্ষর হিংসে সে সবের গণ॥
যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি॥
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না যুয়াএ।
নিজ দেশ ত্যাগি কেন বিদেশে না যায়॥
(আবদুল হাকিম ১৯৮৯: ৪৭২)

বুদ্ধিজীবী উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যে রকম ক্রমাগত প্রশ্ন তোলেন, আবদুল হাকিমকে এখানে সেই অবস্থানে দেখা যাচ্ছে। তিনি হুঁশিয়ারির পাশাপাশি বিরোধী পক্ষকে তাদের আত্মপরিচয় সম্পর্কে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন। সাধারণ মানুষকে ধর্মের নামে আধিপত্যবাদীরা যেভাবে গোলকধাঁধায় নিক্ষেপ করেছে, সেই শাস্ত্রীয় ও ভাষিক আধিপত্যের গোলকধাঁধা থেকে হাকিম মানুষকে বের করে আনার প্রয়াস পেয়েছেন। যদিও যারা আরবি-ফারসির পক্ষপাতী, তারা সংখ্যায় অল্প, তথাপি এই মুষ্টিমেয় জ্ঞানের পুঁজিপতির অধিকার থেকে জ্ঞানের মুক্তি না ঘটলে জ্ঞানের ওপর তাদের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ অটুট থাকবে। এই কর্তৃত্ববাদী জ্ঞান থেকে যে ক্ষমতার উৎপাদন ঘটবে, তা দিয়ে তারা অন্যদের শুধু নিয়ন্ত্রণই করবে। তাই তারা চায় না সেই সব জ্ঞান মানুষের হাতে পৌঁছাক যারা সচরাচর জ্ঞানচর্চার সুযোগ পায়নি। এই শ্রেণির কাছে তাদের মাতৃভাষায় জ্ঞান পৌঁছাতে দেওয়া হয়নি বলে বৃহৎ জ্ঞানকাণ্ড থেকে তারা দূরে পড়ে আছে, যার দরুন তাদের মধ্যে জন্ম নিয়েছে কুসংস্কার। এই জনগোষ্ঠীই সংখ্যায় বৃহৎ। তাই সাঈদ

যেমন বলেন 'বুদ্ধিজীবীদের কর্মতৎপরতার প্রধান উদ্দেশ্য মানুষের স্বাধীনতা ও তার জ্ঞানের সম্প্রসারণ', আবদুল হাকিম সেই কাজটিই করেন। তিনি জ্ঞানার্জনের প্রতি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে, অধিপতি শ্রেণির মতাদর্শিক আধিপত্য নস্যাৎ করার মাধ্যমে সচেতন করেন সাধারণ নিম্নবর্গের মানুষকে।

৪.৪

আবদুল হাকিম যে জনসমাজের জন্য কাব্য রচনা করেছেন, সে সমাজ নির্দিষ্টভাবে বাঙালি মুসলমান সমাজ। তবে তিনি মনে করেন, মুসলমানদের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তিনি মুসলমানের সংজ্ঞায়ন করেন এইভাবে—

> মোহাম্মদ নবীর উম্মত জ্ঞানবন্ত।
> নোঙ্গর আরোপি নৌকা থিবিরে রাখন্ত॥
> বিনি পীরে এহি নৌকা নাহি হয় স্থির। ...
> উম্মতের অর্থ যেবা শুনহ বচন।
> মোহাম্মদী দীন জান গৌরবে পালন॥
> শরীয়ত মঞ্জিলেত করে এবাদত।
> সেহি সে কহিতে পারে নবীর উম্মত॥
> (আবদুল হাকিম ১৯৮৯: ৩২১)

অর্থাৎ মুসলমান হতে হলে তাঁকে অবশ্যম্ভাবীরূপে নবীর উম্মত হতে হবে; আর তা হতে গেলে জ্ঞানবন্ত হতে হবে। এক্ষেত্রে জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি মানুষকে উৎসাহিত করছেন— কিন্তু স্বেচ্ছাচারী হয়ে নয়, বরং পিরের অধীন হয়েই তা করার পথ দেখিয়েছেন অর্থাৎ এই জ্ঞান অর্জনের পথে সহায়ক হতে পারেন পির বা মুর্শিদ। পিরের পরিচয় প্রসঙ্গে গিরীন্দ্রনাথ দাস বলেন—

> পীর শব্দের আভিধানিক অর্থ বৃদ্ধ বা প্রাচীন এবং ভাবার্থ আধ্যাত্মিক গুরু। শব্দটি ফারসী শব্দ। ফারসী পীর শব্দের ন্যায় বৌদ্ধগণ কর্তৃক ব্যবহৃত থের শব্দের অর্থ বৃদ্ধ। সংস্কৃত স্থবির শব্দেরও অর্থ বৃদ্ধ। পীরগণ ছিলেন ইসলাম ধর্মপ্রচারক। (১৯৯৮: ১৫)

পির সাধারণত ইসলাম ধর্মের প্রচারকার্যে নিয়োজিত হলেও এই কাঠামো এ অঞ্চলে নতুন নয়। বঙ্গীয় অবতারবাদী সংস্কৃতির সঙ্গে বোঝাপড়ার মধ্য দিয়েই যেহেতু ইসলাম ধর্মীয় এই কাঠামো বিকশিত হয়েছে, তাই 'হিন্দুর "গুরু", নাথের "যোগী", বৌদ্ধের "থের", আর মুসলমানের "পীর" সমার্থক শব্দ।' (ওয়াকিল ২০১৬: ১১)

পিরের পরিচয় বা গুরুত্ব সম্পর্কে পাঠককে অবগত করার মাধ্যমে হাকিম মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নির্ণয় করতে প্রয়াসী হয়েছেন। এই পরিমণ্ডলে নবীর পরেই তিনি পিরের স্থান নির্দেশ করে বলেন—

> মোহাম্মদ নবী যেন সনদ আসল।
> আর যত পীর সব সনদ নকল॥
> আসলের অনুরূপ নকল লিখন।
> বিচারেত দুই তুল্য নহে কদাচন॥

মোহাম্মদ হন্তে পীর নিশ্চয় খবর।
আল্লার নূর মোহাম্মদ নবীবর॥
আজাজিলে এহি তত্ত্ব না বুঝে কারণ।
আদমের সজিদা না কৈল্য তেকারণ॥
কিবা ছোট বড় যত আদম নন্দন।
এহি সব প্রভু নিজ অংশের সৃজন॥
পীর ছোট বড় হেন করিলে ইঙ্গিত।
দহিব নারক মধ্যে ইবলিস সহিত॥
(আবদুল হাকিম ১৯৮৯: ৩৩৭)

হাকিম শুধু তাঁর নিজের পির নয়, সকল পিরের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন এবং পিরবাদের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য তিনি শাস্ত্র-গ্রন্থ থেকে বিভিন্ন হাদিসের বাণীও উচ্চারণ করে বলেন, 'রসুলের ছায়া বৈসে পীরের উপর।/ কহিছেন্ত হাদিসেতে আপে পয়গাম্বর॥' (আবদুল হাকিম ১৯৮৯: ৩৩৪)। ভারতীয় অবতারবাদের সঙ্গে ইসলামের ধারণাগত পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন হয়েও আল্লাহ, নবি এবং পিরের সম্পর্কসূত্র ব্যাখ্যা করে হাকিম দেখিয়েছেন, নবীর চেয়ে পির অধস্তন কিন্তু প্রত্যেকের নিজের পিরকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে, তা নাহলে নরক গমন অনিবার্য। শুধু তাই নয়, 'বে পীর মরএ যেই জন।/ আজাজীল দুরাচার/ সত্য জান পীর তার/ পাপ তার নাহিক মোচন॥' (আবদুল হাকিম ১৯৮৯: ৩৪০)। অর্থাৎ পিরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করাকে বাধ্যতামূলক ঘোষণা করেন তিনি। আবার এমনটাও ভাবা অস্বাভাবিক নয় যে, বিরাজমান ক্ষমতা-কাঠামোর মধ্যে আধিপত্যশীল শ্রেণি তার ভাবাদর্শের বিসদৃশ এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ জ্ঞানকে ঊন-জ্ঞান বিবেচনা করে। ফলে আধিপত্যশীল শ্রেণি সেই জ্ঞানকে ঠেকানোর জন্য ঐ জ্ঞানের ধারক-বাহকদের নেতিবাচক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়। তাই যারা পিরপ্রথার সমালোচনায় উচ্চকণ্ঠ, ওই শ্রেণির প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে হাকিম মত ব্যক্ত করেন, স্রষ্টার নূর থেকে যেহেতু নবি এবং সকল আদমসন্তান সৃষ্টি হয়েছে, তাই পিরের মধ্যে ছোট-বড় ভেদাভেদ করা যাবে না। হাকিম পিরকে গুরুত্ব দিয়ে ধর্মের জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় এমন এক পথে গমন করতে চাচ্ছেন, যে পথ তাঁকে কেবল গুরুই দেখাতে পারে। তাই তিনি বলেন—

সেবক হাকিম হীনে এহিমতে রাত্রি দিনে
রাজ পন্থে বসিয়া সঘন।
বিরহের প্রতিনিতি নিত্যকার আরতি
প্রেম বন্ধু করে আরাধন॥
শাহাবদ্দী গুণবান সেহি পদ বিনে আন
নাহি রাজ পন্থের নিশান।
(আবদুল হাকিম ১৯৮৯: ১২৫)

অর্থাৎ শাস্ত্রীয় ও ভাষিক কাঠামোর আধিপত্য বিরোধিতার পাশাপাশি হাকিম বিকল্প কাঠামোর প্রস্তাব করেছেন। সে কাঠামো হচ্ছে পিরবাদী কাঠামো। তাই আবদুল হাকিম কোনো কাব্যেই তাঁর বিস্তারিত আত্মপরিচয় দেননি। বিভিন্ন কাব্যে তিনি তাঁর পির শাহাবুদ্দিন এবং পিতা রাজ্জাকের নাম উল্লেখ করেছেন মাত্র। পিতা এবং পিরের নাম অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে স্মরণ করায় বোঝা যাচ্ছে, তিনি পিরপ্রথার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং পিরবাদী ইসলাম মূলত এ দেশের লৌকিক ইসলাম, ফলে তা জনসমাজের সঙ্গে যুক্ত। যেহেতু বৌদ্ধিক বিচার-

বিশ্লেষণের ফলে দেশে দেশে ইসলামের আলাদা আলাদা রূপের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। তাই বাংলাদেশেও লৌকিক সংস্কৃতি, ধর্ম, ভাব ও ভাষার ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে ইসলামের জ্ঞানতাত্ত্বিক মোকাবিলা ঘটেছে এবং এই মোকাবিলায় গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে ইসলাম এক সুফিবাদী চরিত্র লাভ করেছে। আবদুল হাকিম ইসলাম ধর্মের এই প্রাণবান সতেজ জ্ঞান আত্মস্থ করে, আধিপত্যবাদী শাস্ত্রীয় কাঠামোর পরিবর্তে পিরবাদী কাঠামোর প্রস্তাব করেন। যদিও এই কাঠামো উত্তরভারত হয়েই এসেছে, ফলে হাকিম উত্তরভারতীয় সুফিবাদী কাঠামোর সরাসরি অনুসরণ না করে ভিন্ন পথে হেঁটেছেন। অর্থাৎ তিনি কোনো নির্দিষ্ট তরিকার অনুসারী না হয়ে লৌকিক ইসলামের প্রচার করেছেন সাধারণ মানুষের মধ্যে। থিবো বলছেন—

> In spite of the emphasis he put on the worship of the spiritual master (*pir*), he was not affiliated to any specific brotherhood. His works circulated almost exclusively in eastern Bengal and in the Kingdom of Tripura. (2022: 4)

কিন্তু যে পূর্ববাংলা এবং ত্রিপুরায় হাকিমের কাব্যের প্রসার ছিল, সেখানে মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন তরিকার প্রচলন দেখা যায়। এক্ষেত্রে হাকিমের *দুররে মজলিশ* কাব্যে চার খলিফার বন্দনার পরেই, হজরত আবদুল কাদির জিলানির নাম উল্লেখ করেছেন। কাদেরীয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা বড়পির আবদুল কাদির জিলানির নামোল্লেখের পাশাপাশি, হাকিম চার প্রধান মাজহাবের অন্যতম হানাফি মাজহাবের ইমাম আবু হানিফাকে দ্বীনের মই হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে হাকিম, হানাফি মাজহাব এবং কাদেরিয়া তরিকার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন। তবে হাকিম পিরবাদ প্রচারের মধ্য দিয়ে নতুন ভাষা ও দর্শন গড়ে তুলেছেন, প্রস্তাব করেছেন এক বিকল্প ক্ষমতা-কাঠামো, তা বেশ স্পষ্ট। ফলে তাঁর কাব্যে রাজপ্রশস্তির পরিবর্তে জায়গা পেয়েছে পির প্রশস্তি—

> প্রভুর নূর পরে নুর হৈল স্থাপন।
> মোহাম্মদ হোন্তে পীর আউলিয়া গণ॥
> আল্লা হোন্তে পয়গম্বর পীর প্রাচীন।
> আল্লা মোহাম্মদ নবী কেহ নহে ভিন॥
> আবদুল হাকিমে কহে করি প্রণতি।
> পীর বিনে এ তিন ভুবনে নাহি গতি॥
> করুণা সাগর শাহাবদ্দী মোহাম্মদ।
> সে পদে ভরসা মোর ত্বরিতে আপদ॥
> (আবদুল হাকিম ১৯৮৯: ১)

পিরের গুরুত্ব প্রদানের পাশাপাশি হাকিম পির-মুরিদের পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যও নির্দেশ করেন। পিরের কাজ মূলত দ্বিবিধ, তিনি মুরিদের জাগতিক জীবন উৎকর্ষমণ্ডিত করতে সহায়তা করেন এবং কল্যাণময় পারত্রিক জীবনের ব্যবস্থা করেন। হাকিমের ভাষায়, 'এথা পাপ হন্তে পীরে রাখএ সম্বরী।/ প্রলয়ের কালে স্বর্গে নিব হস্তে ধরি॥' (আবদুল হাকিম ১৯৮৯: ৪৫৬)। আবার পিরের ভূমিকা ও ক্ষমতা প্রসঙ্গে ওয়াকিল আহমদও বলেন—

> 'আধ্যাত্মিক গুরু' অর্থে মুসলমান শাসকগণ পীর আখ্যা পেয়ে থাকেন। পীর-দরবেশ শুধু আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অধিকারী নন, তারা লোকচক্ষে অতিমানবিক ও অতিলৌকিক ক্ষমতারও

> অধিকারী হয়ে থাকেন। তিনি পাপীতাপীকে মোহমুক্তির ও চিত্তশুদ্ধির পথ দেখান। তাঁর অনুগ্রহে মজলুম মানুষের কামনা হাসিল হয়। (২০১৬: ১১)

অতএব, মুসলমানের জীবনে পিরের ভূমিকা শুধু পারত্রিক নয়, ঐহিকও বটে। আধ্যাত্মিক উন্নতির পাশাপাশি জাগতিক সুখ-সমৃদ্ধি এবং কল্যাণেও পিরের ভূমিকা স্বীকৃত। পার্থিব-অপার্থিব সকল প্রকার ক্ষতির হাত থেকে পির তাঁর মুরিদকে রক্ষা করেন। হাকিম উল্লেখ করেন—

> শাহাবদ্দী মোহাম্মদ পীর গুণবান।
> কহিতে সমাপ্ত নাই যাহার বাখান॥ ...
> পৃথিস্বীর দেও পরী চিন্তে যার ভয়।
> যাহার তাবিজে কোটী কোটী ব্যাধ ক্ষয়॥
> (আবদুল হাকিম ১৯৮৯: ৪২৪)

পিরের হাতে যেমন রোগমুক্তি ও বিভিন্ন বিপদ-আপদ থেকে রক্ষার উপায় আছে, তেমনি পিরের সেবা করলে অর্থনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনার কথাও হাকিম ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, ‘একমনে ভজে যেবা সেহি রাঙা পায়।/ দিনে দিনে অবশ্য সম্পদ বাড়ি যায়॥’ (আবদুল হাকিম ১৯৮৯: ৪৩৯-৪৪০)

এখানে হাকিম পিরবাদের যে সংস্করণ উপস্থাপন করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে, তিনি রাজনৈতিক ভাষিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ হলেও রাজনৈতিক ক্ষমতা-বলয়ের বাইরে পিরবাদী একটি বিকল্প ক্ষমতা-বলয় তৈরি করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তিনি মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীর হাতে কুক্ষিগত জ্ঞানকে মুক্ত করে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে প্রত্যাশী অর্থাৎ বিরাজমান ক্ষমতা-কাঠামোর পরিবর্তন চান। আবার তিনি যে বিকল্প কাঠামোর প্রস্তাব করেন, সেখানে পির আর মুরিদের ক্ষমতা-সম্পর্কের নতুন আরেকটি স্তরায়ন ঘটে যায়। একদিকে বাংলা ভাষায় শাস্ত্রকথা লিখতে পারা তাঁর বিশেষ সক্ষমতা, আবার অন্যদিকে এই পিরবাদী বিন্যাসে পির হয়ে ওঠেন সেব্য, মুরিদ সেবক; পির নির্দেশদাতা, মুরিদ অনুসারী; পির অধিপতি, মুরিদ অধস্তন। অর্থাৎ পির অনেক বেশি ক্ষমতায়িত হন কিন্তু মুরিদ নবতর প্রান্তিকতায় নিক্ষিপ্ত হন। এ ছাড়াও নতুন ক্ষমতা-বিন্যাসে পিরের ব্যক্তিগত লাভের প্রসঙ্গও আছে। বাংলাদেশে পিরবাদের ইতিহাসে অনেক পিরকেই শাসকঘনিষ্ঠ হিসেবে দেখা যায়, অনেকে আবার যোদ্ধা এবং প্রশাসক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। আর এভাবে, ‘ধর্ম, শিক্ষা ও রাষ্ট্রজীবনে এরূপ নানামুখী ভূমিকার স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁরা শাসকশ্রেণির নিকট থেকে আর্থিক সুবিধা ভোগ ও সামাজিক মর্যাদা লাভ করতেন। পীরোত্তর লাখেরাজ ভূমিলাভ অন্যতম প্রধান সুবিধা ছিল’ (ওয়াকিল ২০১৬: ২০)। অর্থাৎ এই কাঠামোয় বিকল্প পথে পিরের ক্ষমতায়ন চলতে থাকে—তা ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই।

৫

আবদুল হাকিম সতেরো শতকের মুসলমান সমাজের জীবনদর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি রচনার মাধ্যমে বুদ্ধিজীবীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। উদ্ভূত বিশেষ পরিস্থিতিতে তাঁকে বিদ্যমান সাংস্কৃতিক

বিতর্কে যেমন যুক্ত হতে হয়েছে, তেমনি আধিপত্যকামী শ্রেণির বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে উঠতেও হয়েছে। তবে তিনি শাস্ত্রবিরোধী মানুষ নন, বরং শাস্ত্রকে আত্মস্থ করে শাস্ত্রের বৌদ্ধিক বিচার করতে প্রয়াসী হয়েছেন। জনসমাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে তিনি মানুষের জ্ঞানস্পৃহা জাগ্রত করার সর্বাত্মক প্রয়াস পেয়েছেন, যা তাঁর বিস্ময়কর চিন্তাশক্তি ও প্রতিভার পরিচয় বহন করে। তিনি নিজে আরবি-ফারসি ভাষায় পারঙ্গম এবং সেসব ভাষাতে জ্ঞান অন্বেষণের জন্য মুসলমানদের উদ্বুদ্ধও করেছেন। কিন্তু যখন অভিজাত গোড়া রক্ষণশীল শ্রেণি জনসমাজের সঙ্গে যুক্ত না হয়েই তাদের মতাদর্শ চাপিয়ে দিতে গিয়েছেন, তখনই হাকিমের প্রতিবাদ বলিষ্ঠ হয়েছে। তিনি ভাষার চেয়ে বক্তব্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন, তাই *ইউসুফ-জলিখা*র অনুবাদ, *লালমোতি সয়ফুলমুলক* এবং *দুররে মজলিশ* ও *নূরনামা* রচনাকালে ভাষাচিন্তার উত্থান-পতন দেখিয়েছেন।

ইউসুফ-জলিখা, লালমোতি সয়ফুলমুলক কাব্যে তিনি ভাষা প্রয়োগ নিয়ে খুব বেশি কথা বলেননি, কিন্তু যখন *দুররে মজলিশে*র স্বাধীন অনুবাদ করেন তখন তিনি ভাষাকে গুরুত্ব দেন; কারণ লোকশিক্ষা তাঁর জন্য জরুরি ছিল। আবার *নূরনামা*য় তিনি বিক্ষুব্ধ হয়েছেন হিন্দুয়ানি বাংলা ভাষায় ধর্মশাস্ত্র-চর্চার বাধাদানকারী গোঁড়া রক্ষণশীলদের বিরুদ্ধে। এক্ষেত্রে আধিপত্যের বিপরীতে তিনি জনমানুষের ভাষায় শাস্ত্রচর্চার বৈধতা প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হয়েছেন, অর্থাৎ তাঁর সংগ্রাম একাধারে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংগ্রাম। এক্ষেত্রে অভিজাত সমাজের আধিপত্যশীল আচরণের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে কবি আবদুল হাকিম বৃহৎ জনসাধারণের পক্ষ নিয়েছেন এবং বিকল্প হিসেবে পিরবাদী কাঠামো প্রস্তাব করেছেন। যদিও তাঁর প্রস্তাবিত কাঠামো আবার পির ও মুরিদের মধ্যে আধিপত্য ও অধস্তনতার নতুন ক্ষমতা-বিন্যাস তৈরি করে।

সহায়কপঞ্জি

আজহার ইসলাম (১৯৫৮)। *প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

আবদুল করিম ও মুহম্মদ এনামুল হক (২০১৯)। *আরাকান রাজসভায় বাঙলা সাহিত্য*। ঢাকা: আকাশ

আবদুল হাকিম (১৯৮৯)। *আবদুল হাকিম রচনাবলী* (রাজিয়া সুলতানা সম্পাদিত)। ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আহমদ শরীফ (২০১৪)। *বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য* ২য় খণ্ড। ঢাকা: নিউ এজ

আহমদ শরীফ (১৯৭২)। *সৈয়দ সুলতান: তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

আহমদ ছফা (২০১৮)। *বাঙালি মুসলমানের মন*। ঢাকা: হাওলাদার প্রকাশনী

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ (২০২২)। *রিপ্রেজেন্টেশনস্ অব দ্য ইন্টেলেকচুয়াল* (দেবাশীষ কুমার কুণ্ডু অনূদিত)। ঢাকা: সংবেদ

এস এম লুৎফর রহমান (২০০৫)। *বাঙালা লিপির উৎস ও বিকাশের অজানা ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

ওয়াকিল আহমদ (২০১৬)। *বাংলার পীর সাহিত্য ও সংস্কৃতি*। ঢাকা: বইপত্র

গিরীন্দ্রনাথ দাস (১৯৯৮)। বাংলা *পির সাহিত্যের কথা*। কলকাতা: আনন্দ

গৌতম ভদ্র (২০২১)। *বুদ্ধিজীবী কারে কয়* (আ-আল মামুন সম্পাদিত)। রাজশাহী: ম্যাজিক লণ্ঠন

থিবো দুবের (২০১৪)। 'ভাঙিয়া কহিলে তাহে আছে বহু রস: কবি আলাওলের অনুবাদ-পদ্ধতি', *ভাবনগর*। ঢাকা: ভাবনগর ফাউন্ডেশন

ফরহাদ মজহার (২০১৪)। *ভাবান্দোলন*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স

বিনয় ঘোষ (১৯৪৮)। *বাংলার বিদ্বৎসমাজ*। কলকাতা: প্রকাশ ভবন

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন (২০০৪)। *রচনাবলী ১*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ (২০০৪)। *বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য*। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

রাজিয়া সুলতানা (১৯৮৭)। *আবদুল হাকিম কবি ও কাব্য*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

হুমায়ুন আজাদ (১৯৯৮)। *বাঙলা ভাষার শত্রু-মিত্র*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী

D'hubert, Thibaut (2018). *In the shade of Golden palace: Alaol and Middle Bengali Poetics in Arakan*. New York: Oxford University Press

D'hubert, Thibaut (2022). *Meaningful Rituals*. Delhi: Primus Books

Irani, Ayesha A (2021). *The Muhammad Avatara*, New York: Oxford University Press